যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

শহর কলকাতায় স্ট্রিটলাইট থেকে উড়ালপুল, হাইওয়ে থেকে মাল্টিন্যাশনাল বিল্ডিং সর্বত্রই যখন উন্নয়নের ঘনঘটা তখনও কিছু মানুষের মাথার ওপর ছাদটুকুই নেই। মোবাইল কোম্পানি থেকে ব্যাংক সর্বত্রই যখন আধার কার্ড লিংক করা নিয়ে সরগরম, তখন কারওর কাছে হয়তো এগুলো অলীক বস্তু। আপ্রাণ চেষ্টা চালায় একবেলার ঠিকঠাক খাবার জোটানোর। স্টেশন চত্বর হোক বা বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন সাইকেল গ্যারেজ, রাতটুকু কীভাবে কাটবে সেটাই মোদ্দাকথা। কোনওক্রমে একটা ঢাকা নিয়ে পড়ে থাকে আরেকটা সকালের অপেক্ষায়...

ফোটো: **সুজয় চট্টোপাধ্যায়** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

চৈতালি দাশগুপ্ত (সঞ্চালিকা)

আমি কলকাতায় জন্মেছি, কলকাতায় বড় হয়েছি, বলতে গেলে কলকাতাতেই আমার সবকিছু। ফলে আবেগ তো থাকবে, ভালোবাসাও থাকবেই। কলকাতার সাথে সাথে বেড়ে উঠেছি আমি, আর আমার সাথে সাথে কলকাতাও। তার ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। তবে যে নিজের হয়, তার ভালো-মন্দ অত খুটিনাটির হিসাব তো রাখা যায় না।

আমাদের ছোটবেলা যেরকম ছিল এখন পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। এখন যাতায়াতের অসুবিধা যতটা বেড়েছে মানে গাড়ি-ঘোড়া-জ্যাম, তখন তো এরকম ছিল না। যদিও-বা এটা অবশ্য একদিক থেকে ভালো। যে কোনও মেট্রো সিটিতে ভিড় তো বাড়বেই। বছরের পর বছর কত মানুষ এখানে আসছে। আর কলকাতা এমন একটা শহর যে সবাইকে আপন করে নিতে পারে।

আমি অনেক শহরেই গেছি তবে কলকাতার মতো শহর আমি দেখিনি। দিল্লি, মুম্বই মেট্রো সিটিগুলোতে থেকেছি, তবু ফিরে ফিরে মনে হয় কলকাতাই এখনও অবধি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। কলকাতা আমাদের সংস্কৃতির শহর। এখানে সবকিছুতে একটা 'পাগলামি' আছে, আবেগের পাগলামি। আমাদের কলকাতায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প সবকিছুতেই একটা অন্তর আছে। মানে অন্তর দিয়ে করার প্রচেষ্টা আছে। সেটা কিন্তু আমার দেখা শহরগুলোর মধ্যে একমাত্র এখানেই পাই। এত আনন্দ, এত লাইফ— জীবন্ত একটা শহর। কলকাতায় যেমন কাজ আছে, আড্ডার মেজাজটাও আছে। তবে এত সবকিছুর পরেও একটা জিনিস রাস্তাঘাটে বেরোলে বুঝতে পারি মানুষ বড্ড বেশি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন।

আজ থেকে শুরু হল অশরীরী @ কলকাতা সাতের পাতায়

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

ভালো থাকাটাই শেষ কথা

সুমিতা রায়

শনিবার হাফ ডে, তাই দুপুরের ট্রেনে একসঙ্গেই ফিরছিলাম শাশ্বতীদি, আমি আর পিয়ালি। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই সমস্যা থাকে। তবে পিয়ালিকে আজ পাঁচ বছরে দেখেছি কখনই নিজের পজিশন নিয়ে, অফিস নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নয়। আসলে একটা কথা আছে না আয় যত ব্যয় তত। তিনটে চাকরি বদল করেও কখনও তাকে বলতে শুনিনি ও ওর প্রোফেশনে স্যাটিসফায়েড।

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে মুখরোচক খাবার থেকে হকার— কারওর অভাব নেই। আর হকার মানেই কমবেশি এন্টারটেইনার। সেদিনও দু'প্যাকেট গজা কিনে তিনজনে মুখ চালানোর বেশ আয়োজন করছি। ফাঁকা ট্রেনটাতে আমাদের উলটোদিকে একটি বাচ্চা নিয়ে এক মহিলা বসে আছে। হকার আসছে মানে বাচ্চাটির কিছু না কিছু কেনা চাই। বাচ্চাদের যা হয় আর কী!

'হাট্টি মা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম; তাদের খাড়া দুটো শিং...' রসিয়ে রসিয়ে ছড়া বলতে বলতে একজন মধ্যবয়স্ক হকার আমাদের সিটের কাছে এসে দাঁড়াল। পরনের পোশাক বলে দেয় ডিটারজেন্টের সাথে দেখা হয়নি কয়েক যুগ। হাতে এক বাঞ্চ ছোটদের ছড়ার রঙিন সব বই। তাকে দেখেই বাচ্চাটির যথারীতি আবদার শুরু, তাকে ছড়ার বই কিনে দিতে হবেই। বাচ্চাটির মা প্রথমে ভালোভাবে বলতে লাগল, বাচ্চা কিছুতেই কিছু বোঝে না! একটু উত্তেজিত হয়েই মহিলা বাচ্চাকে বললেন, 'কী হবে কিনে দিয়ে, তুমি তো সেই ছিঁড়ে ফেলবে! পড়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।' হঠাৎই হকার লোকটি বলে ওঠে, 'ওরা যদি না ছেঁড়ে তাহলে আমাদের বই বিক্রি হবে কী করে!' কম্পার্টমেন্টের সবার কাছে এটা খানিকক্ষণের হাসির খোরাক হলেও শাশ্বতীদিকে দেখলাম কেমন থম

মেরে বসে আছে।

পরের স্টেশনে হকারটি নেমে গেল। শাশ্বতীদি বলতে শুরু করলো, 'লোকটার চোখদুটো দেখেছিস? তোরা যে ব্যাপারটাকে নিয়ে হাসলি, ওটা হাসির খোরাক ঠিকই তবে একটু গভীরে ভেবে দেখ ওর এই সাধারণ কথার ভেতর লুকিয়ে আছে একটা প্রচ্ছন্ন বিপন্নতা। সত্যিই তো কটা ছড়ার বই-ই বা বিক্রি করতে পারে সারাদিনে? তার ওপর আবার কমিশন এই সেই হেন তেন... তবু দেখ মুখের হাসিটা কিন্তু ধরে রেখেছে। পিয়ালি এ জীবনে আমরা যে যত পাই তার চাহিদা তত। তবে একটা কথা তোকে বলি, ভালো থাকাটা নিজের কাছে। আর ওটাই শেষ কথা।'

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

প্রিয় ‘যুগশঙ্খ সাপ্লি’র পাঠক আপনারা ওয়েবসাইটের ‘রিডার্স কমেন্ট’-এ কিংবা ই-মেইলে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত লিখে জানাচ্ছেন। আমরা ভীষণ খুশি। আমরা আপনাদের মতামত থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছি এবং আপনাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

গড়িয়াহাট মার্কেট

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক-একটি শহরের এক-একটা জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ঠিকানা থাকে। থাকে সেই এলাকার নামের মধ্যে একটা মাহাত্ম্য। প্রয়োজন হোক বা না হোক, সঙ্গে কেউ থাকুক বা না থাকুক, দুপুর বা রাত্রি, সেখানে গেলে দেখা যায় সময় সেখানে অদ্ভুত খেয়ালে নিজের মেজাজে উড়ছে। সময়ের সেই চেহারাটা ধরা না দিয়ে পারে না, আর সেই অনুভূতিটা একেবারে আলাদা। দক্ষিণ কলকাতার এরকম একটি ঠিকানা গড়িয়াহাট এলাকার অন্যতম প্রসিদ্ধ বাজার গড়িয়াহাট মার্কেট।

এটিই গড়িয়াহাটের আদি বাজার। শাক-সবজি-ফুল-ফল-মাছ ইত্যাদির বাজারের কথা বলছি। বেশ প্রাচীন এই বাজারটি। ব্রিটিশ আমলে, ১৯৩৭ সালে তৎকালীন পুরসভার হাতে বাজারটির পত্তন হয়। রাসবিহারী এভিনিউ আর গড়িয়াহাট রোডের সংযোগস্থলে বিশাল এই গড়িয়াহাট মার্কেটের রূপ এরকম ছিল না। ইতিহাস বলে এখানে প্রথমে বাংলো টাইপের টিনের শেড ছিল। সেই অবয়ব দিয়েই শুরু এই মার্কেটের।

পরবর্তীকালে কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ এই বাজারটি নতুন রূপ পায়। পুরসভার বাজার-সংক্রান্ত একটি স্থায়ী অফিসও আছে এখানে।

গড়িয়াহাট বাজারে পাওয়া যায় না এমন জিনিস খুব কমই আছে। ফুল, ফল, গাছের নার্সারি, যাবতীয় সবজি, মাছ, মাংস, দশকর্মা সব এক-একটি অংশে থরে থরে সাজানো। পুরনো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানা যায় আগে সব এলাকা নির্দিষ্ট করা ছিল। ফলের দিকে শুধু ফল, সবজির দিকে শুধু সবজি, সব আলাদা। মাছের বাজারটিও বিশাল। আর এর খ্যাতি এইজন্যেও যে সহজলভ্য হোক বা দুষ্প্রাপ্য, বাঙালির প্রিয় যে কোনও মাছই এখানে পাওয়া যায় সারা বছর। মূল্যও যথাযথ। শুধু এলাকার মানুষই নয়, বেশ দূর থেকেও অনেক ভোজনরসিক আসেন এখানে পছন্দের ভালো মাছ কেনার জন্য।

নতুন বহুতল বিল্ডিংয়েও অনেক ব্যবসায়ীর জায়গা হয়েছে। কী না পাওয়া যায় সেখানে! এমনকী ঘর-গেরস্থালির যে কোনও জিনিস বা ছোটখাট যন্ত্রপাতি সারিয়ে নেওয়ার দোকানও রয়েছে। এরপর আসি বৃহত্তর বাজারের কথায়। একদিকে গড়িয়াহাট রোডের উপর বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে গোলপার্ক (পুরো অংশটাতেই রয়েছে ফ্লাইওভার), আর অন্যদিকে রাসবিহারী এভিনিউয়ের উপর বিজন সেতু থেকে প্রায় ট্রাঙ্গুলার পার্ক পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি রাস্তারই দু’ধারে অজস্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ফুটপাথ জুড়ে অগুন্তি ছোট ছোট দোকানে হরেক পসরা সাজিয়ে রয়েছেন অসংখ্য হকার। বলা বাহুল্য এই দোকানগুলি ‘অস্থায়ী’, কিন্তু তাদের ব্যবসাও কিছু কম নয়। ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের মধ্যেও চলে এক প্রতিযোগিতা। একদিকে বড় প্রতিষ্ঠিত দোকানগুলি যেমন সমস্ত বয়সির জন্য হাল ফ্যাশনের জামাকাপড়, সুন্দর ডিজাইনের অভিজাত শাড়ি, আধুনিক অলংকার ইত্যাদির জোগান অব্যাহত রেখে গড়িয়াহাট তথা কলকাতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে, অপরদিকে তেমনি হকারদের অস্থায়ী ছাউনিতেও উপস্থিত ক্রেতাদের পছন্দের নানা সামগ্রী। তবে সেখানে দর কষাকষি করাটাই দস্তুর। আর রয়েছে অনেকগুলি সুপরিচিত রেস্টুরেন্ট।

গড়িয়াহাট বাজার প্রায় সারা বছরই ভিড়ে ঠাসা, বিশেষ করে চৈত্র সেল আর পুজোর সময়। সে-সময় একটু জায়গা করে ফুটপাথ ধরে স্থায়ী আর অস্থায়ী দোকানগুলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারা যেন লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া। আর একটু দরদাম করে কিছু পছন্দের কিনতে পারা তো যুদ্ধ জয় করা। গড়িয়াহাট বাজারের মজাটা এখানেই।

আহিরী সম্প্রদায়ের ঘাট

নীহারিকা

গঙ্গার পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝেমধ্যেই কানে আসছে ট্রেনের হুইসল। আমার বাঁ-পাশ দিয়ে আমারই মতো বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা, আর ডাইনে এগিয়ে গেছে চক্ররেলের লাইন। নিমতলা বিসর্জন ঘাটের খুব কাছেই আহিরীটোলা ঘাট। দূর থেকে দেখতেই ভালো লাগে কারণ ঘাটের প্রবেশদ্বারের নির্মাণশৈলী অন্য ঘাটের থেকে ভিন্ন। উত্তর কলকাতার নামী ঘাটগুলির অন্যতম এটি। এখানে ফেরিঘাটও রয়েছে। ঘাটটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত। সিঁড়ির দু’ভাগ নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। এখন ঘাটটি ব্যবহার করা হয় মূলত স্নানের জন্য, সঙ্গে চলে শ্রাদ্ধশান্তির কাজও। ঘাটের প্রবেশদ্বারের মধ্যে ঢুকলে মনে হবে ছোটখাটো কোনও বাজার বসেছে। বিক্রি করা হচ্ছে পুজোর ফুল, গঙ্গামাটি, গঙ্গাজল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যান, লেবু লঙ্কা, পিণ্ডদানের উপকরণ ইত্যাদি। ফেরিঘাটে যেতে হলে অন্য পথ দিয়ে ঢুকতে হবে।

এবারে খোঁজ নেওয়া যাক ঘাটের ইতিহাস সম্পর্কে। প্রতিটি ঘাটের সোপানে রয়ে গেছে কিছু না কিছুর কথা। গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র দৃশ্য দেখে মন ভরে না। অতীতের কথাও শুনতে চায় মন। এক সময় নাকি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল গোয়ালপাড়া। ছিল অনেকগুলি খাটাল। সেখানে থাকতেন আহির সম্প্রদায়ের লোকজন, যাঁরা গোয়ালা এবং গবাদি পশু নিয়ে কাজকর্ম করেন তাঁদের ‘আহির’ বলা হয়ে থাকে। ইতিহাস বলছে, অতীতে শুধুমাত্র গবাদি পশুদের স্নান করানোর জন্যই এই ঘাট ব্যবহার করা হতো। পরবর্তী সময়ে গোয়ালপাড়ার মানুষেরা ব্যবহার করতেন এই ঘাট। সম্ভবত এখানকার আহির সম্প্রদায় থেকেই ঘাটের নামকরণ করা হয়েছে।

বর্তমানে অনেকেই একে আহিরীটোলা ফেরিঘাট বলে থাকেন। এখন ঘাটকে ঘিরে জনবসতি এবং একাধিক দোকান গড়ে উঠেছে। আর আছে অটোরিকশার ভিড়। এইখান থেকে সহজেই অটো চড়ে সোজা বি কে পাল অ্যাভিনিউ চলে যাওয়া যায়। ঘাটকে কেন্দ্র করে কোনওরকম সৌন্দর্যায়নের প্রয়াস চোখে পড়ল না। তবে কলকাতা পুরসভা এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে নিয়মিত আহিরীটোলা ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঘাটের বিভিন্ন ফলকে। ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই দেখা যায় ওপারের মন্দির। কিছুক্ষণ অন্তরই দেখতে পাচ্ছি ঘাটের সামনে দিয়ে স্টিমারের আসা-যাওয়া আর পিছনে চক্ররেলের যাতায়াত। জলযানের কোনওটি যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন, আবার কোনওটি বাগবাজার ঘাটে।

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেও মনে হয় শুধু যাওয়া-আসা আর ভরা গ্রীষ্মের কড়া রোদে স্রোতে ভাসা। গরম কিছুটা কাবু করলেও পরের গন্তব্যে পৌঁছে যাব। আবার কোনও ঘাটের পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করব ঘাটের কথা। সে অন্য কাহিনি, অন্য ইতিহাস।

ফোটো: লেখিকা

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

জনসমুদ্রে জলতরঙ্গ

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

সেদিন সারা কলকাতা জুড়ে কী তুমুল বৃষ্টি। সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। প্রবল বজ্রবিদ্যুতে চমকে উঠছে চারিপাশ। অফিস থেকে লোকে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। ইস্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। না, বৃষ্টির জন্যে নয়। সকালবেলায় যখন অল ইন্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর সঙ্কটে রয়েছেন তখন থেকেই হাজার হাজার লোক জোড়াসাঁকোর সামনে জড়ো হচ্ছেন। কেউ বলছেন, 'বিধান রায় মেরে ফেলল।' কেউ বলছেন, 'তিনি আবার বেঁচে উঠবেন, তারকেশ্বরের এই মন্ত্রপূত ফুল এনেছি, একবার যদি গায়ে ছোঁয়ানো যেত, বেঁচে যেত।' ক্রমশ রাগে ফুঁসছে শহর। শহরজুড়ে রটে গিয়েছে কবি অপারেশন করাতে চাননি, প্রায় জোর করে অপারেশন করেছেন ডাক্তার বিধান রায়। ডাক্তার নীলরতন সরকারও নাকি চাননি কবির অপারেশন হোক। পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়নি তখনও। অস্ত্রোপ্রচারের পরে সেপটিক হয়ে গিয়েছে কবির। বাঁচবার আর কোনও আশা নেই। জোড়াসাঁকোর বারান্দা থেকে শুধু দেখা যাচ্ছে মানুষের মাথা। তাঁরা ভোর থেকে বৃষ্টিতে ভিজছেন কিন্তু তাঁদের কোনও খেয়াল নেই বৃষ্টি নিয়ে। জোড়াসাঁকোর এই বাড়িতেই একটি ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল আশি বছর আগে। এমন সাধারণত খুব কম হয়। মানুষ যেখানে জন্মায় সেখানে হয়তো আর ফিরেই আসা হয় না সারাজীবনে। রবীন্দ্রনাথ, যিনি দুনিয়ায় এত ঘুরলেন, এত কাজ করলেন, কতকিছু দেখলেন কিন্তু তাঁর প্রয়াণ যেন ঠিক সেখানেই হবার ছিল যেখানে তাঁর জন্ম। ঘরটার নাম পাথরের ঘর। সেখানে শুয়ে রয়েছেন তিনি। চক্ষু মুদ্রিত। জ্ঞান নেই বলছেন চিকিৎসক। তবে প্রিয়জনদের মনে হচ্ছে কবির মুখে যেন ক্ষীণভাবে ফুটে উঠছে কিছু কিছু অভিব্যক্তি। সকাল ন'টার সময় তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। শুরু হল অক্সিজেন। মাথার কাছে বসে পড়া শুরু হল উপনিষদ। বাইরে উত্তাল হতে শুরু করেছে জনসমুদ্র। কবি কি বেঁচে আছেন? যদি কবি আর না থাকেন তবে কীভাবে হল কবির মৃত্যু? সেপটিক হয়ে যেতে পারে জেনেও কেন অপারেশন করা হল? কী করছেন বিধান রায়? জানতে চায় মানুষ। জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ছে মানুষের রাগ। সেই প্রথম প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের ওপর ভয়ানক বিক্ষোভে ফুঁসে উঠল এই শহর। বিধান রায় গাড়ি থেকে খুলে ফেললেন ডাক্তারের লোগো। জোড়াসাঁকো বাড়িতে পিছনের দরজা দিয়ে লুকিয়ে ঢুকলেন বিধান রায়। মাথা ঢেকে নিলেন চাদরে। যাতে লোকে চিনতে না পারে। এই শহর যদি তাঁকে আজ চিনতে পারে তাহলে আর তিনি আস্ত থাকবেন না। যেভাবে জ্বলে রইল একটি প্রদীপ শিখা। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদে গেল কবির ভৃত্য বনমালী। বাইরে অনেক মানুষ যেমন কান্নায় ভেঙে পড়ল তেমনি অনেকে আবার চেষ্টা করল কবির নিস্পন্দ শরীর থেকে একটু চুল ছিঁড়ে নিতে বা কাপড় থেকে কিছু অংশ কেটে নিতে।

একটি লম্বা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ ছেলে। সুন্দর টিকালো নাক, উজ্জ্বল চোখ। সেই ছেলেটি দূর থেকে দেখছেন কবির শরীর যেন মানুষের কালশিটে ঢেকে গেলেও একটা দগদগে দাগ কিছুতেই ফুল দিয়েও ঢাকা গেল না। ছেলেটি লিখল 'একটা মালা এসে পৌঁছল তবে বড্ড দেরিতে।' সেই ছেলেটি সেই কবিতাটিতে বারবার লিখল যে কবির গলার কাছে একটা দগদগে দাগ; সেটা কিছুতেই ফুল দিয়ে ঢাকা গেল না। ছেলেটির কবিতা অনুযায়ী কবির শরীরে সেই দাগ আর ক্ষতটা ক'দিন আগেই নাকি হয়েছে কারুর আঘাতে। ছেলেটির নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে যাঁর

জোড়াসাঁকোর চারপাশের জনসমুদ্র রাগে ভয়ানক গর্জন করছে তাতে বোঝা যায় বিধান রায়কে হঠাৎ হাতে পেলে মেরেও ফেলতে পারে উন্মত্ত জনতা। বিধান রায় লুকিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকে কবি যে-ঘরে শায়িত সেখানে গেলেন। কবির পরিজনদের বললেন, 'নো চান্স।' কোনও আশা নেই। বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে এসেছে করির চরণ। একটু পরে থেমে গেল হৃদ্‌স্পন্দন। সাদা বেনারসি জোড়, চাদর, চন্দন গোড়ের মালায় সাজিয়ে কবির নিস্পন্দ শরীর জোড়াসাঁকোর বাইরে বেরোল। জোড়াসাঁকোয় কবির ঘরে সমুদ্রে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ছেলেটি ভাবছে এত ফুল, মালা, জনরব এসব কিছুতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ওই নিস্পন্দ শরীরের অনেক কালশিটের দাগ। ঢাকা পড়ে যাচ্ছে শনিবারের চিঠি। ঢাকা পড়ে যাচ্ছে 'অবতার' বলে একটা জঘন্য পত্রিকা, একসময় কবি যাদের দু'হাতে উপকার করেছেন তাঁরাই একসময় একজোট হয়েছে কবিকে অপমান করবার সংকল্পে। এইসব ভাবছে সেই শ্যামলা রোগা ছেলেটি। সে বাড়ি ফিরে একটা কবিতা লিখছে। সেই কবিতায় সে লিখছে ফুলে মালায় কবির শরীরের সব উদ্দেশ্যে তিনি এত তীব্র শ্লেষ ছুড়ে দিলেন তাঁর নাম চিরকাল বাংলাভাষায় উহ্য হয়ে রইল। জনস্রোতের ঢেউয়ের ওপর ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল রবীন্দ্রনাথের নিস্পন্দ শরীর। রবীন্দ্রনাথের সেই নিস্পন্দ দেহ থেকে চোখ ফেরানো যাবে না। জুঁই ফুলের মতো গায়ের রং, সাদা রেশমের মতো চুল, সাদার ওপর সোনালি জরির কাজ করা বেনারসির জোড় শরীরে। এত সাজানো হয়েছে কবিকে বহুদিন পরে। যেন মনে হচ্ছে সেদিন কবির জন্মদিন। মেঘাচ্ছন্ন দিনেও যেন এক টুকরো রোদ্দুরের মতো লাগছে কবির ভাসমান শরীরটাকে।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর),
সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.banglarmukh.com**)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (**www.wbprd.nic.in**)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া -৭১১১০২ (**www.wbfin.nic.in**)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbhealth.gov.in**)
- **পরিবেশ দফতর** (**www.enviswb.gov.in**)
- **পূর্ত দফতর** (**www.pwdwb.in**)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (**www.vahan.wb.nic.in**)
- **কৃষি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.wbagrisnet.gov.in**)
- **সেচ দফতর**, জলসম্পদ ভবন, ব্লক-ডিএফ, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbiwd.gov.in**)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.coopwb.org**)
- **মৎস্য দফতর**, ৩১, ব্লক-জিএন, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbfisheries.gov.in**)
- **প্রাণী সম্পদ দফতর**, এলবি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbard.gov.in**)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (**www.wbfood.gov.in**)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsed.gov.in**)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.tathyabangla.gov.in**)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (**www.wbyouthservices.in**)
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতর**, বিকাশ ভবন, নর্থ ব্লক, দশম তল, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsc.gov.in**)
- **বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর** (**www.wbdma.gov.in**)
- **ক্ষুদ্র শিল্প দফতর** (**www.mssewb.org**)
- **বিদ্যুৎ দফতর**, বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbpower.nic.in**)
- **অচিরাচরিত শক্তি দফতর**, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.wbreda.org**)
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর**, অম্বর, ডিডি-২৭/ই, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbmdfc.org**)
- **অনগ্রসর কল্যাণ দফতর**, প্রশাসনিক ভবন, এসডিও বিধাননগর, চতুর্থ তল, ডিজে-৪, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.anagrasarkalyan.gov.in**)

ইটিং রয়েছে, কিন্তু কুকিং কি আদৌ রয়েছে?

অভিমন্যু রায়

ছেলেবেলায় দেখেছি, জামাইষষ্ঠীর ‘সেই’ খাওয়া। থালার পাশে বাটি ভর্তি কত রকমের পদ রাখা! ব্যাপারটা বড় লোভনীয়। মা-ঠাকুমারা সেই সকাল থেকে হেঁসেলেই সময় কাটাতেন। শুধু জামাইষষ্ঠী নয়, যে কোনও অনুষ্ঠানে স্মৃতিগুলোর মধ্যে খাওয়ার স্মৃতিগুলো এখনও উঁকি মারে।

পৃথিবীর সব দেশে, সবকালেই নবীনরা বিগতকে ‘তিরছি’ নজরে দেখে থাকেন। কিন্তু একেবারে প্রাইমারি ইনস্টিংক্টের জায়গাতেও তাঁরা প্রাচীনকে উড়িয়ে দেবেন, এমন বড় একটা দেখা যায় না। প্রাইমারি ইনস্টিংক্টের পয়লা জায়গাটা অধিকার করে থাকে রসনা। পুরনো রেসিপির সংরক্ষণ এবং তাকে যুগোপযোগী করে তোলার কাজটা পৃথিবীর অন্য সংস্কৃতিতে বজায় থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গে তেমনটা দেখা যায় না।

১৯ শতকের বাঙালির পাত আলো করত যেসব খাবার, তার অধিকাংশের সঙ্গে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেরই কোনও যোগ ছিল না, একবিংশ তো দূর অস্ত। পরশুরামের সেই গল্পটি বিংশ শতকে রচিত। এখানে উক্তিটি করা হয়েছিল খেদের সঙ্গেই। ‘অ্যাংলো মোগলাই রেস্তোরাঁ’-য় বসে কেদার চাটুজ্যে আর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কথোপকথনে কী হারাইলাম গোছের একটা রাউন্ড আপ চলছিল। অ্যাংলো মোগলাই রেস্তোরাঁর মতো ফুড জয়েন্টের উত্থান তদ্দিনে বাঙালির একান্ত সাধের আহার লুচি-পাঁঠাকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে।’ কেদার চাটুজ্যের এই উক্তি ছিল সেই লুচি-পাঁঠার এলিজি বিশেষ।

বাঙালির পাত থেকে লুচি-পাঁঠার অবলোপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগ ও তৎপরবর্তী ডামাডোল। উত্তর কলকাতার এথনিক অবস্থানে লুচি ঠিক কতটা জায়গা জুড়ে থাকে, তা যেমন দক্ষিণ অনুমান করতে পারে না। ঠিক তেমনই একান্ত ঘটিবাড়ির পরম্পরায় লুচির অমোঘত্বকে পুববাংলার মানুষও বুঝতে পারবেন না। কিন্তু মিলেনিয়াম কালচারে একটা আপোস হয়েছে। দক্ষিণের রাপচিক সব এথনিক ফুড জয়েন্টে লুচি-মাংস এক অনিবার্য পদ। কিন্তু প্রশ্ন এখানেই, এই লুচি-মাংস আর কেদার চাটুজ্যের ‘লুচি-পাঁঠা’ মোটেই এক জিনিস নয়। খেয়াল করুন, গত দেড় দশকে কলকাতার আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা বাঙালি এথনিক ফুড জয়েন্টগুলোর মেনুকার্ডের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে পুববাংলার পদ। আড়-বোয়াল-শুঁটকি অধ্যুষিত সেই সাম্রাজ্যে লুচি ফুলকো হয় বটে, কিন্তু পাঁঠা কিছুতেই পাঁঠার মতো নয়।

বুজুর্গরা বলবেন, পাঁঠা বা ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ইদানীংকালে অলভ্য। আর হরিয়ানা বা পঞ্জাবের রেওয়াজি খাসি দিয়ে বিরিয়ানি, রোগন জোশ, রেজালা হতে পারে কিন্তু বাঙালির একান্ত আদরের পাঁঠার ঝোল অসম্ভব। বাড়িতে তৈরি করলে দেখা যায়, কেমন একটা ছাড়ো ছাড়ো ভাব সেই ঝোলে। ফাইবারে দাঁতের ফাঁক জর্জরিত করতে করতে বাঙালি সোনাপারা মুখ করে মাসে অন্তত দুটো রোববার তা-ই ভক্ষণ করে। ভক্ষণ করতে বাধ্য থাকে। তার উপরে নতুন ফুড জয়েন্টগুলোয় মাংসের যে পদটি পরিবেশিত হয়, তা কষা মাংসের মাসতুতো ভাই। কিন্তু বাঙালির চির চেনা পদটির নাম ছিল ‘পাঁঠার ঝোল’। মাংস সেখানে গৌণ, তার মূল আকর্ষণের জায়গাটা ছিল তার আলু। বাঙালি এথনিক জয়েন্টে আলুর দেখা পাওয়া গেলেও, ঝোল-মাংস-আলুর একত্রে ঘণ্টাখানেকের ফোটাফুটির আত্মীয়তা তাতে নেই। মেকওভার আর গ্যাটিসের রেসিপিতে সেখানে পাঁঠার ঝোলের মধ্যে ঝোল, আলু আর মাংসের কেমন একটা ভেঙে যাওয়া যৌথ পরিবারের ছাঁদ। এটাও মনে রাখা দরকার, মাংস-ভাতের ঝোল আলু-লুচি-পাঁঠার ঝোলের মধ্যেও রেসিপির ফারাক ছিল। ঘনত্বের তারতম্য ছিল। তাতেই ঘটত স্বাদের ফারাক।

রেসিপির সংরক্ষণ বাঙালির জীবনে খুব একটা ঘটেনি। হারিয়ে গিয়েছে অসংখ্য পদ। গ্লোবাল বাঙালি দ্রুত হাতে অ্যাডপ্ট করেছে পাস্তা থেকে পিৎজা, কিন্তু শুকনো আলুপোস্ত, চালকুমড়োর শুক্তোর মতোই এনডেঞ্জার্ড হয়ে গিয়েছে লুচি-পাঁঠার যুগলবন্দি। একে বাঁচাতে কী ভাবছেন এথনোম্যানিয়াক বং-প্রজন্ম, জানার আগ্রহ রইল।

রান্নাঘর এঁটোকাঁটায় ভরানোর বালাই নেই, স্রেফ কিনলেই গরমাগরম। সাবেকি খাদ্যপুরাণে যাই লেখা থাক, এদেরকেই-বা ‘ফাস্ট ফুড’ বলা হবে না কেন? তো ফাস্ট ফুড না? ইয়ার্কি? আলবাত ফাস্ট ফুড। এটা যদি না হয়, তো অন্য কিছুও না, যাও বাড়ি যাও। কোনও গা-জোয়ারি না, সাফসুতরো লজিক। ধরুন ব্রিগেড হচ্ছে, পাটিগণিত বলছে লরিবোঝাই সাপোর্টার বুলাও, তা সে নয় ভাড়া হল, কিন্তু সক্কাল সক্কাল ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা, মেট্রো এসকেলেটর দেখে যখন পেটে দেড় হাত লম্বা ছুঁচোর কেত্তন আরম্ভ হবে, তখন শান্তি আসে কীসে? বাঙালি ভাতে আর ফিশে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে রাঙাপটে কিলোখানেক ধ্যাবড়া। মসিহা হয়ে ধরাধামে নামে তখন, পাড়াতুতো বিরিয়ানির প্যাকেট। আলুথালু হাবভাব, এই সাইড থেকে চাট্টি ভাত হড়কে গেল, ওই ধারে ছাপ ছাপ তেল উঠে এল, অল্প পোয়াতি গড়ন, আর লাল ফিতে খুললেই কেওড়া-টেওড়া মেশানো স্কুলপ্রেম টাইপ থরথর আবেগ। আহা, ভগবান তুমি সত্যি হাইক্লাস! ইমোশন ছাড়িয়ে বলি, অমন চটজলদি খিদের সলিউশন, জিন্দেগিতে আর দুটো নেই। কর্মিসভা বা বড় কোনও জমায়েত বাদ দিন, ধরা যাক, একটু লেট করে বাড়ি ফিরছেন, নিজে রান্না শিখে উঠতে পারেননি, আবার সাইমোলটেনিয়াসলি বাড়িতে মা/বউয়ের ব্যবস্থাও করে রাখা হয়নি, ম্যাগিও তো এ বাজারে আবার...তো তখন মুশকিল আসান কে? কোরাসে উত্তর আসে একটাই। বিরিয়ানি।

হ্যাঁ এখন যদি আপনি হাইক্লাস অভাগা হন, যে পাড়ায় একটাও ‘গরম তাওয়া’ বা ‘খানা-খাজানা’ গোছের দোকান নেই, তা হলে আলাদা। কিন্তু তেমনটা না হলেই, আর নো ঝক্কি। লাল ট্যাক্সির কাপড় টাইপ স্যাঁতসেঁতে মখমলে মোড়া অ্যালুমিনিয়ামের থালার ওপরের ডালাটা সরিয়েই, প্লেট প্লেট বিরয়ানি উঠে আসবে হাতে। একটা মাংস, একটা আলু আর সেলার জেনারাস হলে, এক পিস স্লিপারি ডিম্ব। এমনকী আলাদা থালাও লাগবে না, ওই ময়লা সাদা প্যাকেটই অল-পারপাস। একটা বাড়তি কুটোটি নাড়তে হল না, ওদিকে আহ্লাদের ঢেঁকুর উঠে একসা। ফাস্ট ফুড নয়তো কি? প্লিজ এক্সপ্লেন। যেমন দ্রুত গতিতে মঞ্চে প্রবেশ, তেমনই পরিপাটি প্রস্থান, কিন্তু কী সাংঘাতিক ছাপ ফেলে যায় আত্মায়, আলাদা করে বলতে হয়? আরে তৈরি করার কথা ছাড়ুন, আপনি বাঁচলে পরের নাম। খিদে বা সাময়িক অসুবিধের মুখে আপনি কি ঘটা করে তদন্ত কমিটি গঠন করবেন, যে দেখি তো রন্ধনশৈলী, প্রক্রিয়া, সময়, গুণবিচার ইত্যাদি? বরং ঝটপট কিনবেন, খুলবেন, খাবেন, হয়ে গেল... চ্যাপটার শেষ। বিরিয়ানি ফাস্ট ফুডের এই সকল ক্রাইটেরিয়াই তুলকালাম রূপে পালন করে। অতএব বিরিয়ানি ফাস্ট ফুড। প্রুভ্ড। আর আপনি না মানলেও, বয়েই গেল, বাঙালির দিন আনি দিন খাই অবস্থা ঘুচেছে হয়তো, বিরিয়ানি আনি বিরিয়ানি খাই অবস্থা ঘোচার নয়!

এ-ও নিঃসন্দেহে ফাস্ট ফুড পর্যায়ের। কেন নয়? এখানে ব্যাখ্যা মূলত টিফিনকারিতে আসা দুপুর-রাত্তিরের মিল-এর। আমি তো মুখের সামনে পাচ্ছি, জাস্ট ডালা খুলে খেলেই হল। আর খাওয়া মানে কী, ভ্যারাইটি দেখুন। ভারতের মতো। একই বৃন্তে কত কুসুম। এমনকী এগ মিল না নিলেও। ভাবা যায়! এ ফাস্ট ফুড শুধু সিংগুলার আদমিদের নয়, প্লুরাল যাঁরা, তাঁদেরও অন্তরঙ্গ সাহারা।

জাস্ট মানসচক্ষে সার্ভে করুন, আপনি প্রবল খেটেখুটে বাড়ি ফিরেছেন বা একেবারেই খাটাখাটনি করেননি, তবুও এমনই মজ্জাগত আলসেমি আপনার, যে মিনিমাম শরীর নাড়াবেন না, তো এই ভ্যাপসা গরমে আপনাকে তখন মাথায় হাত বুলোনোর পর্যন্ত কেউ নেই, ওই হয় একে বা পাঁচে ঘোরা পাখা ছাড়া। শরীর দিচ্ছে না আর, যে উঠে এবার তরিবত করে রাঁধবেন কিছু, ঠিক তখনই টিফিনক্যারি হতে যদি ভাত, ডাল, একটা ভাজা, পোনা মাছের কালিয়া আর শেষ পাতে এক আঁজলা আমের চাটনি ঠিকরে বেরোয়, বুকে হাত রেখে বলুন ইচ্ছে করবে না, নিজে কাজল হয়ে টিফিনক্যারিরূপী শাহরুখকে সুপার স্লো-মো-তে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে?

হাইজিন নিয়ে এখানে ভয় নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির মতোই তো রান্না হয়ে আসে হোম ডেলিভারির খাবার। আর আসে কী, না সেই দিনকার ভাত-ডাল (মানে তা-ই তো অর্ডার দিয়ে থাকেন অধিকাংশ)। ফলে এই ফাস্ট ফুড, যেন বাজারচলতি অন্য ফাস্ট ফুডের মতো নয়ই। মুখরোচক হতে গেলে এ বান্দাকে বহির্জগতের চটকের (ওরফে গ্যাদগেদে তেল, মশলা, ধুলো, বালি) ওপর নির্ভর করতে হয় না, জাস্ট রাঁধুনির কেরামতিই কাফি। বলা যায় অলমোস্ট মেড টু অর্ডার ফাস্ট ফুড। আর এই যে টিফিন কেরিয়ারে করে তিন-চার তলার রকমারি খাবার অপশন, তা তো এক অর্থে বাড়ির দোরগোড়ায় পোর্টেবল একটি ফাস্ট ফুড কোর্ট। ইন্টিগ্রেটেড একটা প্যাকেজে।

রুটি-তরকা— এই আর এক তুলকালাম জুটি। ঝোল-ঝাল লেবড়ে ফেলার চান্স নেই, শুকনোর ওপর দিয়ে বেশ ছিমছাম, তীব্র ভাগ্যবিপর্যয় না হলে স্টমাক বিপর্যয়েরও সুযোগ অল্পই। আর যাঁদের তরকা খেয়েও যেতে হয় বারবার,

এরপর পরের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

গুরুভক্তি

কৃষ্ণগোপাল রায়

বর্ণভেদ প্রথায় ব্রাহ্মণের কাজ ছিল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন ও যাজন। নিজে পড়াশোনা করে জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন, পড়াবেন, পূজাপাঠ-যজ্ঞাদি করবেন, আর অন্যান্য বর্ণের গৃহে পূজাপাঠ-যজ্ঞাদি করে তাদের মঙ্গলবিধান করবেন। সম্ভবত এই শিক্ষাদান ও অপরাপর বর্ণের গৃহে পূজাদি-মঙ্গলাচারের সূত্রেই গুরুর উদ্ভব।

বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠার পূর্বস্তরে যখন কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে-ই-বা শূদ্র পরিগণিত হবে তা নিশ্চিত হয়ে যায়নি; তখনই নির্ণীত হয়েছিল ব্রাহ্মজ্ঞান আছে যার সে-ই হবে ব্রাহ্মণ। সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মজ্ঞানের প্রমাণ দিয়েই ব্রাহ্মণ হওয়া যেত; পরে যারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র পরিগণিত হয়েছে তারাও ব্রাহ্মজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব দাবি করতে পারত। সম্ভবত ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের এই সুযোগ অনেকদিন প্রচলিত ছিল। মুনি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কিন্তু এ উদাহরণ ভুরি ভুরি নেই প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে। কারণ শাস্ত্রাদি মূলত ব্রাহ্মণের রচনা এবং ওই সুযোগ তারা বন্ধ করতে চেয়েছিল নিজেদের স্বার্থে। একদা সে স্বার্থ পূরণও হয়েছে। ব্রাহ্মজ্ঞানের পরিচয় না দিয়েই কেবল ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া গেছে। আর, যখন থেকে ব্রাহ্মণত্ব হয়েছে জন্মগত, তখন থেকেই শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণের আদর্শচ্যুতি। যাবতীয় সামাজিক বিধি-বিধানে নিজেদের অপরিহার্য করেছে তারা। কিন্তু ভূমির অধিকার ক্ষত্রিয় আর ধনের অধিকার প্রথমাবধি বৈশ্যের করায়ত্ত হওয়ায় ধনবান ছিল না তারা। যদিও শিষ্যাদি সন্তানসহ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি হিসাবে। একদা এদের একটি অংশ নির্দেশিত কাজে অবহেলা করে চাষবাসে বেশি মন দেওয়ায় তাদের ব্রাত্য করা হয়; অর্থাৎ তখনও জাগ্রত বিবেক তারা। আরও পরে নির্দেশিত কাজের মধ্যে থেকেই কিছু অধিক উপার্জনের চেষ্টায় তারা বাড়িয়ে তোলে ক্রিয়া-করণ, বিধি-বিধান। একটা সময়ে দেখা গেছে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং যজন-যাজন একসঙ্গে করা বেশ কষ্টসাধ্য। প্রবণতা অনুসারে এসময় আবার তাদের মধ্যে বিভাজন দেখা যায়। অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে যারা প্রাধান্য দেয় তারাই হয়ে ওঠে শিক্ষাগুরু; আর পূজা-পাঠ, যজন-যাজনকে যারা প্রাধান্য দেয় তারা হয়ে ওঠে ধর্মগুরু বা গুরু।

শিক্ষায় সবার আগ্রহ নেই। কিন্তু ভয়ে-ভক্তিতে ধর্মের নাতা কেউ আটকাতে পারে না। এইখানেই ধর্মগুরুদের পোয়া বারো। বেদ-অধ্যয়ন, পরে সংস্কৃত ভাষাচর্চা এবং সেই সূত্রে ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় কুক্ষিগত করে আগেই নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছিল ব্রাহ্মণ, তাই মূঢ় যজমানকে ঠকাতে বেগ পেতে হল না। প্রতিষ্ঠা করা হল ঈশ্বরের আগে গুরুর স্থান, 'গুরুদেব মহেশ্বর', গুরুকৃপা ছাড়া ঈশ্বরের আনুকূল্য পাওয়া যাবে না; 'গুরুকৃপাহি কেবলম', সুতরাং অবাধে 'ওম গুরুভে নমঃ'।

গুরু বাড়িতে এলে যজমান ধন্য। সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করা হতো, কোলের বাচ্চাকে পর্যন্ত তার পায়ের কাছে শুইয়ে দেওয়া হতো, নিদেন ঠেকানো হতো পায়ে। বাড়ির কর্ত্রী যত্নে তার পা ধুইয়ে দিতেন, পা মুছিয়ে দিতেন চুলের বাঁধন খুলে। বাড়ির সবচেয়ে বড় হাওয়াদার ঠান্ডা ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হতো। খাটের উপর কোমল বিছানা, তার উপর দুধসাদা চাদর পেতে দেওয়া হতো, রাখা হতো তুলতুলে কোলবালিশ, আর দেওয়া গোটা দুই নরম বালিশ। সেকালের কলকাতায় টানা পাখার ব্যবস্থা করা হতো, নিদেনপক্ষে বাড়ির বউ বা তরুণী কন্যাটি অনবরত হাওয়া করত তালপাতার পাখায়।

গুরুসেবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকত সারা পরিবার। অধিকাংশ নিরামিষাশি বলে দুধ, দুধজাত সমস্ত সুস্বাদু খাদ্য, মিষ্টি এবং ফলমূলাদির বিপুল আয়োজন থাকত। গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হতো পরিবারের সকল সদস্যদের। শুধু প্রসাদই নয়। তাঁর পাদোদক— অর্থাৎ পা-ধোয়া জল পান করত পরিবারের সদস্যরা।

গুরু সেকালে সতত একদিনের জন্য আসতেন না এবং একাও আসতেন না। সঙ্গে যে গদগদ শিষ্যকুল বা অনুচরদের আনতেন তারা গায়ক, বাজনদার, খোল-করতাল সঙ্গে নিয়েই আসত। গুরু নিজেও গাইতেন। তার গানে কথার চেয়ে তন্ময়তা বেশি, সুরের চেয়ে বিভোরতাই বেশি দেখা যেত। তাদের গানের ভাব যেমন মরমিয়া কথাও তেমনি। মাধুর্যে ডোবানো রহস্যময়। মুখে মিটিমিটি হাসি খেলিয়ে সেই রহস্য মাঝে মাঝে গুরু নিজেই ব্যাখ্যা

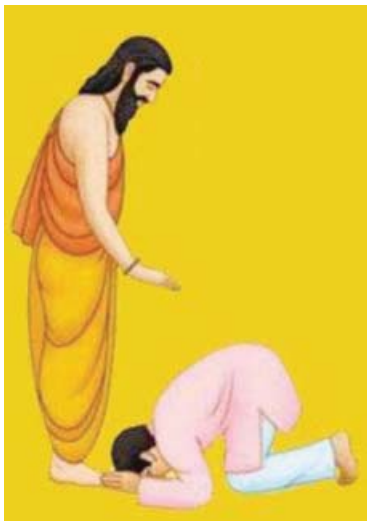

করতেন।

ঠিক এমনই এক গুরুকে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। তাঁর নাম স্বামী লীলানন্দ। সদলবলে তিনি বিহার করতেন। কলকাতায় তাঁর অধিষ্ঠান হতো শিবতোষ নামে এক শিষ্যের বাড়িতে। শিবতোষের বিষয়-সম্পত্তি সবই তাঁর শ্বশুরের দেওয়া। কিন্তু শ্বশুর যখন ব্যবসা-দুর্বিপাকে ভীষণ সংকটের মধ্যে পড়েন তখন তাঁর মেয়ে দামিনী কিছু গয়না দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। শিবতোষ স্ত্রীর অজান্তেই গয়না সমেত বাক্সটাই দিয়ে এসেছিল গুরুজিকে। গুরুজি নিশ্চয়ই সব জানতেন, তবু অকাতরে সে গয়নার বাক্স গ্রহণ করেছিলেন। দয়া বা সদবিবেচনা তাকে কোনও দ্বিধায় ফেলেনি। শিবতোষ মারা যায় অল্প বয়সে। তার আগে সে নিজের কলকাতার বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি এবং নিঃসন্তান যুবতী স্ত্রী দামিনীকে সম্প্রদান করে যায় স্বামিজীর হাতে। স্বামীজি এবারেও গ্রহণে অকাতর। শিবতোষের নাম তিনি উচ্চারণও করেন না। কিন্তু তার সমস্যা হল দামিনীকে নিয়ে। ভেবেছিলেন অনাথাকে অনায়াসে মিলিয়ে নিতে পারবেন তাঁর দলে, করতে পারবেন অপরাপর শিষ্যদের মত বশংবদ, শচীশের মতো তাকে দিয়ে কলকে সাজাতে পারবেন। তা তিনি পারেননি দামিনীর বিদ্যুত্বহ্নি ব্যক্তিত্বের জন্য।

কিন্তু সংসারে ক'জন মেয়ে দামিনী? গুরুজিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, রাজসুখের আহার-বিহার, অসংখ্য সেবাদাসী বেড়ে যেত এমন করেই। 'হুতোম প্যাচার নকসা'-তে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন—

'আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখেতে পাইনি। গোঁসাই বললেই একটা বিকটাকার ধূম্রলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেমন বিয়ারিং পোস্ট আয়েস ও আহার-বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জোটবার জো নেই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়াদমন পুতনাবধ গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলাগুলি করে থাকেন।'

শিষ্যদের ভালো করে জানানো হয় 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর এই পঙ্‌ক্তিগুলো—

'যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥
প্রেমারাধ্যা রাধা সমা তুমি লো যুবতী।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি॥'

গুরুই কৃষ্ণ; অতএব, গাছের প্রথম ফল, জমির নতুন চালের অন্ন, নতুন বিয়ানের দুধ, দুধজাত প্রথম মিষ্টান্ন ইত্যাদি যেমন সর্বাগ্রে দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন উৎসর্গ করা হতো, তেমনি গুরুকেও। গুরু প্রসাদ না করে দিলে কিছুই ভোগ করা যায় না। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাস তৈরি ও পুষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুদেরই চতুর উদ্যোগ ছিল বেশি, কারণ তাতেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি। অন্ধ গুরুভক্তি বৈষ্ণবদের মধ্যে এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিলেন যে 'গুরুপ্রসাদী' নামে একটা স্বতন্ত্র প্রথা গড়ে উঠেছিল। এই প্রথানুসারে বিবাহিত বধূকে প্রথমে গুরুর সঙ্গে সহবাস করতে হতো, তারপর স্বামীর।

উনিশ শতকের তিনের দশকের এই অন্ধপ্রথা বিদ্রোহ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে পরবর্তীকালে? নারী শোষণের প্রবণতা একেবারে লুপ্ত হয়েছে তা বলা যাবে না। গুরুরা এখনও অনেকে নারীলোলুপ; তবে ভয় ও সতর্কতা বেড়েছে। পুরুষদের কাছে গুরুদের কদর কলকাতায় অপেক্ষাকৃত কম; সুশিক্ষিত মেয়েদের কাছেও; কিন্তু এখনও মেয়েরাই এইসব গুরুদের প্রধান আশ্রয়। তারা দামিনী নয়। গুরুদের প্রভাব তাই কমেনি; এখনও গুরু সমাদর ঈর্ষণীয়; তবে গুরুকে আহ্বান করা গৃহস্থের সংখ্যা কমে গেছে কলকাতা শহরে; বিয়ে-শ্রাদ্ধ-উপনয়নাদিতে আগমন হলেও অধিষ্ঠানের জায়গা নেই, গুরুকে ফিরতে হয় দিনের দিন। বিশেষ ক্ষেত্রে যজমানই যায় গুরুগৃহে, গুরুদক্ষিণা দিয়ে নিয়ে আসে তাঁর আশীর্বাদ আর উপদেশ। কুলগুরুদের বাইরে নড়াচড়া কিন্তু শহরে আসেন বড় বড় পাচক। পাঁচ-সাত দিনের ক্যাম্প চলে, প্রবচন চলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে। তবে এদের অধিকাংশই অবাঙালি, বাঙালিরা বরং ভিড় করে বেলুড়ে, তেঘরিয়ায় সৎসঙ্ঘের অনুষ্ঠানে। গুরুমোহ কাটেনি, রূপান্তর ঘটেছে, গুরুমন্ত্রের প্রয়োজন এখনও অনেকেরই।

লেখক চাপরা বাঙালবি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

আলোচনা @ কলকাতা *(চারের পাতার পর)*

তাঁদের প্রতি অশেষ করুণা, অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ তাঁদের। সে যাক, মানিকজোড়ের এমনই গুডউইল যে, প্রায় ফাস্ট ফুড জগতে অতীব হেলদি আখ্যানও পেয়ে যায় আরকী।

অন্তত আজ অবধি কোনও কড়া জ্যাঠামশাইকেও শুনিনি, তীব্র ভাষায় এ জুটির নিন্দে করছেন। সদ্যবিবাহিত ও সদ্য স্বাধীনভাবে সংসার পাতা দম্পতির অস্তিত্বরক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার। শশী কাপুরের যেমন কিছু না থাক মা ছিল, তেমনই লক্ষ লক্ষ ইয়ং দম্পতিরও কিছু না থাক, একটা পরিচিত রুটি-তরকার দোকান আছেই। ইতিহাস ঘাঁটুন, যান দেখুন। আবার আচমকা অতিথি আপ্যায়নেও এ জুটি মারকাটারি। স্পেশালি বন্ধুদের সঙ্গে একটা বেশ ইনফর্মাল আড্ডারত রাতে, রুটি-তরকা অতুলনীয়। অতিথিগমনের পরও দম্পতির বাসন মাজো, টেবিল পরিষ্কার করো, এটা তোলো, সেটা রাখো ভাবনা নেই। তড়কা থকথকে হওয়ায়, ঘটা করে বাসন মাজারও ঝক্কি নেই। ওই একটু কলের তলায় ধরলেই হল। এর আর একটা মজা হল, যে যেমন ইচ্ছে খেতে পারে।

অর্থাৎ কেউ তরকার বেসিক প্রকারটিই খেতে পারে, আবার চাইলে, কেউ তাতে টমেটো সস, গোল গোল করে পেঁয়াজ কাটা, লঙ্কাকুচি-টুচি দিয়ে বা আরও এগজোটিক কিছু ছড়িয়ে মিশিয়েও খেতে পারে। অর্থাৎ একই দেহে কত রূপ। এমন ফ্লেক্সিবল ফাস্ট ফুড দুনিয়ায় আর আছে কি না ঘোর সন্দেহ। বিরিয়ানির মতো এ-ও পাড়াতুতো দোকান থেকে বিনা পরিশ্রমে পাওয়া সম্ভব। পারিশ্রমিকও সামান্যই, আর সম্ভার বলতে মূলত দু'রকমের, ডিম ছাড়া ও ডিমওলা। উপলব্ধ যেখানে সেখানে এবং যখন-তখন। জনমানবহীন হাইওয়ের ধার, আলটপকা কোনও শহরতলির মোড়, পাহাড়-সমুদ্র-খাল-ডোবা-টিপি-ধাপা-জঙ্গল যেখানেই স্মরণ করিবে, অবশ্যই রুটি-তরকা পাইবে।

আমরা ট্যাঁশ নই। অতএব চা আমরা খাই। দেয়ারফোর চায়ের চেয়ে বেটার ও জনপ্রিয়তম ফাস্ট ফুড আর কীই-বা? প্রশ্ন। এখানে চা বলতে কিন্তু বিরাট গ্রিন, মিন্ট, হার্বাল, উলং-ফুলং রেফার করা হচ্ছে না। চা অর্থাৎ প্লেন দুধ চা, লাল চা-ও, যা বাঙালি আঁতেলা টু বাতেলা চকাস, সুরুপ এবং আরও নানাবিধ আওয়াজ সহকারে খেয়ে থাকে। যে কেউ তৈরি করতে পারে, ইনফ্যাক্ট ম্যাগি ছাড়া চা-ই তো সেই খাদ্যদ্রব্য, যা কোনও হোস্টেলে থাকা পুরুষ বা প্রথমবার রান্না করার বৃহৎ প্রকল্প-নেওয়া নারী, সাধারণত শিখে থাকে। এই ফাস্ট ফুড হোমো স্যাপিয়েন্সকে, বিশেষ করে বাঙালিদের তো বটেই, স্বনির্ভর হতে শেখায়। সামাজিক হতেও তো শেখায়। কাচের গ্লাস, স্টিলের গ্লাস, ভাঁড়, কাপ (কাপেরও আবার বেঁটে, মোটা, ফাটা ইত্যাদি ভাগ আছে) সবেতেই মানানসই এই চা, এক লহমায় একটা জটলা তৈরি করে দিতেও ওস্তাদ। মানে, ওই এক কাপ চায়ে আমি সবাইকে চাই। এক দঙ্গল বসে গেল হয়তো এক সঙ্গে, তারপর চলল আলপিনের কথা টু এলিফ্যান্ট... আর অধিবেশন শেষে, স্পটে গেলে কাপের কুম্ভমেলা, টেবিলক্লথে অল্প ফেড হওয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাপের নীচের দাগ। এই একটাই দৃশ্য বলে দেবে, কী জীবন্ত আবহাওয়া খেলে বেড়িয়েছিল সে অঞ্চলে, লহমাখানিক পূর্বে। বটবৃক্ষ টু ধেড়ে টু বুড়ো-হাবরা টু সদ্য গোঁফওঠা, সমস্ত বয়সেই যে এমন অ্যাকসেপ্টেন্স, অন্য কোনও ফাস্ট ফুডের জীবদ্দশায় নেই। এমনকী শুনেছি তো চা খাওয়ার বেশ কটা কী সব যেন পজিটিভ হেলথ বেনিফিটও রয়েছে। তাহলে? সত্যজিৎ রায় যখন ছোট ছিলেন, তখন দেখতেন এক ছোটকাকুকে, কত ধরনের যে চা তৈরিতে ব্রতী। আর আমরা যখন ছোট ছিলাম, দেখতাম, এই একটাই খাবার, যা খাওয়ার পারিবারিক পারমিশন পাওয়া মানেই, তুমি বড়ো হয়েছ। অর্থাৎ আর মা পেছন পেছন দুধ আর মিষ্ক বিকি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করবে না।

প্রকৃত অর্থেই তবে চা একটি কামিং অব এজ ঘটনা। সত্যি এমন বেনিভোলেন্ট একটা যে ফাস্ট ফুড হওয়া সম্ভব... ভেবেও কেমন গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। জীবনের প্রতিটা ওঠাপড়ার মুহূর্তেই দেখবেন চা পোষ্য হয়ে আপনার সঙ্গ দিয়েছে। সদ্য বাচ্চা হওয়ার আনন্দে যেমন আপনি ওকে পেয়েছেন, নার্সিংহোমের ঠিক উলটো ফুটের গুমটিতে, ঠাকুমা হারানোর শোকেও তেমন শ্মশানের বাইরে, কাঠের বেঞ্চিতে বসে, চাট্টি লেড়ের সহিত। আর প্রেমিকা অতিকষ্টে হ্যাঁ বলার পরও ঢকঢক করে উইদ আ প্রজাপতি অফ কোর্স। তো যা দাঁড়াচ্ছে, তা হল, গ্যালনখানিক খড়ের গাদার মধ্যে সদ্যোজাত ছুঁচ খুঁজে পেয়ে যাবেন, তবুও এমন চিরজীবনের সঙ্গী, হারগিজ আর দুটো পাবেন না। আরে বাবা-মা'র এক্সপায়ারি ডেট আছে, বউয়েরও ডিভোর্সের, ওই এক মাত্র চায়ের দাগ... বীভৎস গুঁড়ো সাবানের প্রকোপ সামলেও, টিকে যাবে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

যুক্তি-তর্ক-আড্ডা @ কলকাতা

হেলমেট নিয়ে এত সতর্কতা, তবু কি বাড়ছে হেলমেটের ব্যবহার?

তন্ময় মণ্ডল

শহর জুড়ে অ্যাক্সিডেন্টের মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। প্রসাশনও নড়েচড়ে বসেছে সে বিষয়ে। একের পর এক নিয়মও তৈরি হচ্ছে। একটি সমীক্ষা বলছে, শহরে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার বেশিরভাগই বাইক-অ্যাক্সিডেন্ট। তাই অনেক কড়া হয়েছে ট্রাফিক আইন। হেলমেট ব্যবহার নিয়েও অনেক সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। অনেক কঠিন করা হয়েছে বিনা হেলমেটের যাত্রীদের ফাইন এবং নিয়মকানুন। জরিমানার টাকাও ব্যাংক মারফত জমা হবে এমন নিয়ম অনেকক্ষেত্রেই। তবুও বারবার অনেক জায়গাতেই ঘটছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্রাফিকের ভুমিকা নিয়েও বিতর্ক উঠছে অনেক ক্ষেত্রেই। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কতটা কার্যকরী হচ্ছে? হেলমেট নিয়ে এত সতর্কতা তবু কি বাড়ছে হেলমেটের ব্যবহার? এই নিয়েই আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

সোমা রায় (ট্রাফিক পুলিশ-কর্মী): আগের থেকে অনেক বেড়েছে বাইক চালকদের হেলমেটের ব্যবহার। এমনকী রুল-ব্রেক ব্যাপারটাও অনেক কমেছে। আর 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' অনেকটাই কার্যকরী হয়েছে। রাস্তায় রোজ নিজে ডিউটি করে, নিজে চোখে দেখে অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

বিশ্বজিৎ পাল (চাকুরিজীবী): আমাদের রোজ রাস্তাতেই দিনের অনেকটা সময় কাটে। বাইক রাইডারদের প্রসঙ্গে শুধু নয় এ ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে আইন করে কিছু করা সম্ভব নয়, যদি না মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন আসে। মানুষের নিজে থেকে সচেতন হওয়াটা আগে দরকার। এবার আসি হেলমেটের প্রসঙ্গে, সরকার তার মতো করে অনেক আইন আনছে তার প্রয়োগও হচ্ছে; তবে যথাযথ কিনা সেটা কিন্তু অনেকটাই প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি। অনেক পেট্রোল পাম্পের মুখেই দেখি ১০ টাকায় হেলমেট পাওয়া যায় কারণ হেলমেট ছাড়া পাম্প তেল দেবে না। এটা বড় হাস্যকর ব্যাপার নয় কি?

শুভঙ্কর সরখেল (প্রাক্তন অধ্যাপক): আমি নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করি মাঝে মাঝে। রাস্তাঘাটে অনেক জিনিসই চোখে পড়ে যা সত্যিই খুব দৃষ্টিকটু। বাইকের সংখ্যা তো শহরে মুড়ি-মুড়কির মতো বাড়ছে। আর হেলমেটের প্রসঙ্গে আর কী বলব! সত্যি বলতে কি এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার শুধু হেলমেট কেন, যে কোনও রুল ব্রেক করলেই ২০০ টাকার ফাইন বিল ছাড়া ৪০-৫০ টাকাতেও রফা হয়ে যায়। শুধু শুধু হেলমেট নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কী? নতুন আইন করে কিছু লোক শুধরে গেলেও এখনও একটা বড় অংশের বাইক-আরোহীর কাছে এটা 'কুছ পরোয়া নেহি' মনোভাব ছাড়া কিছু নয় বলেই আমার মনে হয়।

নিরঞ্জন দেবরায় (সমাজকর্মী): এটা নিয়ে তো অনেক রকম সচেতনতামূলক প্রচার হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি দু'রকমভাবেই। একটা কথা তো অস্বীকার করা জায়গা নেই যে নিজের ভালো কেউ না বুঝলে সরকার বা প্রশাসন কী করবে!

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

চলার পথের শেষ লগ্নে

পান্থজন

চিৎপুর রোডের উপর চলার শেষপর্বে শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের কথা এবং দুই মন্দিরের ইতিহাসের কথা জেনে আবার এগিয়ে চলি। এবার চলেছি বাগবাজার মোড়ের দিকে। চারমাথার মোড়ে পৌঁছে একটু দাঁড়াই। ডাইনে ঘুরলে পৌঁছনো যাবে শহরের অন্যতম প্রাচীন বারোয়ারি দুর্গোৎসবের প্রাঙ্গণে। এর আশেপাশে রয়েছে অজস্র শাঁখার দোকান আবার বাঁদিকে একটু এগোলেই পড়বে বাগবাজার ফেরি ও স্নানের ঘাট। এছাড়া চক্ররেলের স্টেশন তো আছেই। আবার সোজা এগিয়ে চলি। আপাতত এই এলাকায় বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই। অবশ্য কিছুটা পরেই রাস্তার শেষ অংশের উপরে রয়েছে একটি পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত স্নানের ঘাট।

ঐতিহাসিক এই স্নানের ঘাটটি 'মায়ের ঘাট' নামেই পরিচিত। একদা মা সারদা

প্রতিদিন সকালে তাঁর বাগবাজারের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে এখানে আসতেন স্নান করতে। কয়েক বছর আগে পুরনো ঘাট সংস্কার করে নবকলেবরে সজ্জিত করেছে কলকাতা পুরসভা। কাছেই বাগবাজারের এঁদো গলিতে মা থাকতেন এক সময়। সেই ঐতিহাসিক বাড়িতে এসেছেন ভগিনী নিবেদিতা। বাংলার ১৩১৬ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার এই বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন মা সারদাদেবী। এই বাড়িতেই তিনি দেহরক্ষা করেন ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ, মঙ্গলবার। আজও তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে নিয়মিত পুজার্চনা চলে এবং ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়াও দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং মায়ের জন্মতিথির মতো বিশেষ উৎসবও পালিত হয়। প্রতিদিনই হয় ভক্ত সমাগম।

'নাই নাই নাই যে বাকি সময় আমার'। সময়ও আর নেই পথও আর খুব বেশি বাকি নেই। আর সামান্য পথ এগোলেই আমাদের নির্বাচিত চলার পথ গিয়ে মিশবে বড় রাস্তায়, যেখানে গঙ্গার উপরে রয়েছে চিৎপুর লকগেট। কর্মরত অবস্থায় কর্তব্য সাধনে শুধুমাত্র একবারই চলবার হুকুম নিয়ে এসেছি এই পথে। হয়তো অনেক কিছুই জানবার এবং বোঝবার বা দেখবার বাকি থেকে গেল। সম্ভবত অনেক কিছুই রয়ে গেল অজানা এবং পাঠককে বলা হল না। এখন অপেক্ষা আবার নতুন অবকাশের জন্য।

এই দীর্ঘ রচনায় চেষ্টা করেছি যাত্রাপথের আনন্দগান পাঠকদের শোনাতে। লিখতে গিয়ে এমন আভাসও পেয়েছি যে রচনাটি নাকি একঘেয়ে। নতুন কাল, নতুন পছন্দ এবং রুচির সঙ্গে তফাত যে রয়ে গেছে এটা বুঝতে পারি এবং স্বীকার করি। পুরনো কলকাতার পথের ইতিহাসের থেকেও ঢের বেশি মনোগ্রাহী ঝাঁ-চকচকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নতুন শপিং মলগুলির কথা। ভালো কতটা লেগেছে সেটা বলতে পারবেন একমাত্র শ্রদ্ধেয় পাঠকরাই। এই পথের আমি ছিলাম পথিক আর রাজপথের উপর ছিল লক্ষ লক্ষ পথের সাথী। তাই পরিশেষে বলি 'ওগো পথের সাথী নমি নমি বারংবার, পথিকজনেরও লহ লহ নমস্কার।'

ফোটো: লেখক

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

অশরীরী বা ভূত শব্দটার মধ্যেই রয়েছে একটা অজানা, অলৌকিক, গা-ছমছমে ভাব। ভূত নিয়ে জল্পনা-কল্পনার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই তর্ক-বিতর্কেরও। আবার এই বিষয়ে মানুষের কৌতূহলও সীমাহীন। তাই কলকাতা শহরের যেখানে তথাকথিত 'তেনাদের বাস', সেই সমস্ত জায়গা নিয়েই আজ থেকে শুরু হল কলকাতা সাপ্লির নতুন সেগমেন্ট...

অশরীরী @ কলকাতা

সন্ধ্যা নামলেই ছুটে যায় অশ্বারোহী

সোমনাথ আদক ও সৌরভ মণ্ডল

The City of Joy নামে পরিচিত প্রায় তিনশো বছরের পুরনো যে-শহর তার আনাচে-কানাচে যেমন রয়েছে আলোর ম্যাজিক, ভিড়ে ঠাসা মানুষের ব্যস্ততা, কোলাহল তেমনি কলকাতার ইট, কাঠ, পাথরের পাঁজরে লেগে আছে বহু পুরনো অনেক রহস্যময় কল্পকথা। History থেকে সেগুলোই কখন His Story হয়ে, হয়ে ওঠে লোককথার কাহিনি। সে কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে, আলো-অন্ধকারে আবার কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে কোনও এক অলৌকিক, অদৃশ্য, কাল্পনিক অবয়ব। যুক্তিবাদী চোখে যাকে দেখা যায় না আবার অস্বীকার করার উপায়ও থাকে না তার অস্তিত্ব। সে হয়তো ছিল, সে হয়তো আছে। হয়তো সে এখন আপনার ঠিক পিছনেই হাঁটছে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন তার পায়ের খসখস। আপনার সিক্সথ সেন্স বলছে, কে যেন পিছু নিয়েছে আপনার। কিন্তু কে? আপনি পিছনে তাকালেন। দেখলেন কেউ কোথাও নেই। রাস্তাটা ফাঁকা, সুনসান। নির্জন দুপুরের গরম হাওয়ায় কালো পিচের ওপর দিয়ে কতগুলো শুকনো বাদামি পাতা সর সর শব্দে উড়ে গেল। আপনি আরও দ্রুত পা চালালেন। নির্জন দুপুরের সুনসান রাস্তায় কে ফলো করছে আপনাকে? এইমাত্র কারই-বা নিঃশ্বাস অনুভব করলেন আপনার ঘাড়ের কাছে? তবে কি ভূত? ভূত বলে কি আদৌ কিছু হয় নাকি পুরোটাই আষাঢ়ে গপ্প? আসলে ব্যাপার আর ঘটনাগুলো ভারি অদ্ভুতভাবে ছড়িয়ে রেখেছে রহস্যের জাল। এমনি অনেক রহস্য ছড়িয়ে আছে কলকাতা শহর জুড়ে।

চিড়িয়াখানার খুব কাছেই বেলভেডের এস্টেটের ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ১৩০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত এর সুবিশাল এলাকা। বর্তমানে এশিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার। কলকাতার প্রায় ১৮০ বছরের পুরনো ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেমন কুড়ি লক্ষ বই, পাঁচ লক্ষ পাণ্ডুলিপি, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র ও সাময়িক প্রকাশনার মূল্যবান সামগ্রীর সাথে আছে বিরল সংগ্রহের বই, প্রাক্ ব্রিটিশ আমলের মূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রকৃত চিঠিপত্র এবং মন্তব্যের ভাণ্ডার তেমনি গ্রন্থাগারের অনাচে-কানাচে বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে লেগে আছে রহস্যময়তায় ভরা গা ছমছমে নানা কাহিনি। শোনা যায় রাতের অন্ধকার নামলেই নাকি গ্রন্থাগারের রূপ বদলাতে শুরু করে। অন্ধকারের বুক চিরে কোথা থেকে যেন ছুটে আসে অশ্বারোহী।

এখানে যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত আছে তাঁরা অনেকেই নানা অলৌকিক ঘটনার বর্ননা দিয়েছেন। কেউ বলেন, পড়তে পড়তে হঠাৎ ঘাড়ের কাছে অদৃশ্য কারও নিঃশ্বাস অনুভব করেছেন। আবার কারো মতে, নির্জন দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে কারা যেন হেঁটে চলে বেড়ায় লাইব্রেরির করিডোরে। শোনা যায় তাদের পায়ের শব্দ, অনুভব করা যায় তাদের অস্তিত্ব; কিন্তু দেখা যায় না কাউকে। অনেকে মনে করেন এটা নাকি গভর্নর লর্ড মেটকাফ সাহেবের স্ত্রীর অতৃপ্ত আত্মা।

যেসব লাইব্রেরিয়ানরা এখানে কাজ করেন তারা বলেন, কে যেন আচমকা টেনে নেয় তাদের চেয়ার। বইয়ের পাতা আপনা-আপনি উলটে যায়। কোনও কারণ ছাড়াই বুকসেলফ থেকে বই পড়ে যায় মেঝেতে। এখানকার রাত প্রহরীরাও অনেকেই এমন অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে নাকি ছুটে যায় অশ্বারোহী। বলডান্সের ফ্লোর থেকে ভেসে আসে কনসার্টের করুণ সুর। শোনা যায় পালকির আওয়াজ। লাইব্রেরির বন্ধ দরজার ভেতর থেকে আওয়াজ পাওয়া যায় বইয়ের পাতা ওলটানোর। রহস্যে মোড়া এইসব অলৌকিক ঘটনার যুক্তি, ব্যাখ্যা দিতে পারেনি কেউ। তবে প্রাচীন এই শহরের ইতিহাস কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে তার। ১৭৮০ সালের ৭ আগস্ট সকালে এখানেই নাকি রয়্যাল হেস্টিংসের সাথে ফিলিপ ফ্রান্সিসের গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল। সেই লড়াইয়ের নেপথ্যে ছিলেন পরমা সুন্দরী এক নারী, ম্যাডাম গ্রান্ট। তাদের প্রণয়ের স্মৃতি নাকি ফিরে ফিরে আসে লাইব্রেরির চত্বরে।

সেদিন গুলিবিদ্ধ ফ্রান্সিসকে পালকি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর হেস্টিং সাহেব বেলভেডের এস্টেটে আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। আজও সন্ধ্যা রাতের গা ছমছম করা লাইব্রেরির করিডোর বরাবর হেঁটে গেলে কিছু কি বলতে চায় তাহলে সেদিনের সেই ইতিহাস? সাদা রঙের এই প্রাসাদোপম বাড়িটির সিলিং, খিলান ছুঁয়ে যেমন প্রশ্ন আছে অনেক তেমনি আছে অলৌকিক রহস্যের ইন্দ্রজাল আর হাড় হীম করা রোমাঞ্চকর কল্পকথা...

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩ জুলাই ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কলকাতা এক সীমাহীন আবেগের রাজধানী

সলাউদ্দিন আইয়ুব (ফোটোগ্রাফার)

কলকাতা শহরটা কেন যেন মনে হয় খুব আপন, খুব চেনা। কলকাতায় এই তো সেদিন গেলাম প্রথমবার, এই তো সেদিন গেলাম দ্বিতীয় বার ... তৃতীয়বার... কতবার যে গেছি গুনে বলা মুশকিল। তবু 'এই তো সেদিন' গেছি মনে হয় কারণ প্রত্যেকটা স্মৃতি, কলকাতায় কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত আমার হৃদয়ে জ্বলজ্বল করে এখনও। বিভেদের কাটাতারের এপার-ওপারে আমরা দু'দেশের মানুষ ঠিকই তবে আমাদের আত্মার যোগ তো আছে, তা হল বাংলা ভাষা।

আমার কাছে কলকাতা এক সীমাহীন আবেগের রাজধানী। কলকাতায় আমার যেমন আছে প্রচুর বন্ধু-বান্ধব তেমনই আছে আমার পূর্বপুরুষদের ভিটেবাড়ি। যদিও সেখানে আর আমাদের অধিকার নেই তবু আবেগ তো আছে। এই শহর নিরবিচ্ছিন্ন নিয়ন আলোর মতো একটা মায়াবী অভিঘাত নিয়ে কখনও ধরা দেয় আমার কাছে আবার কোনও জনবহুল বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। যেখানে পালটে যাবার স্বাদ রাস্তায়-রাস্তায়, অলিতে-গলিতে। প্রথম কলকাতা গিয়েছিলাম সালটা সম্ভবত ১৯৯২ কি '৯৩, আর শেষবার গেছি ২০১৪-তে। প্রায় দশ বছরের এই ফারাকে দেখেছি রেসকোর্সের সেরা ঘোড়াটার চেয়েও বেশি জোরে দৌড়চ্ছে কলকাতা। পটলডাঙা স্ট্রিট থেকে রাজা নবকৃষ্ণ দেব স্ট্রিট এত দ্রুত পালটে গেছে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, দোকানপাট—তা হয়তো এখানে থাকা কোনও মানুষের চাইতে বাইরে থেকে আসা আমারই মতো কেউ খুব ভালো বলতে পারবে।

কলকাতায় গিয়ে প্রথমবার ছিলাম দমদমে শিল্পীবন্ধু নগেন আচার্যর বাসায়। আসলে জীবনটাই তো কেটে গেল ভবঘুরে হয়ে তাই বন্ধু তো থাকবেই অনেক। নগেনের বাড়ি থেকে কলকাতার একটা গ্যালারি শো-তে অংশ নিয়ে গিয়ে উঠলাম আমারই মতো আরেক ভবঘুরে লক্ষ্মণ রক্ষিতের কাছে। আজ লক্ষ্মণ বেঁচে নেই, ২০১৪ তে শেষবার ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই কলকাতা গিয়েছিলাম। তবে সেই '৯৩ আর আজকের গড়িয়াহাট আকাশ-পাতাল ফারাক।

আসলে যতবার কলকাতায় গেছি ততবার বিভিন্ন রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে এই শহর আমাকে। একবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল লোকাল ট্রেনে আমার পকেটমারি হয়ে গেছিল। সোনারপুরের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছি, সেদিকের ট্রেনে তখনও সড়গড় হইনি এত। একাই যেতে হয়েছিল। সেই সময় তো আজকের মতো হাতে হাতে মোবাইল ফোনের এত চল ছিল না। এক টেলিফোন বুথের লোককে সব খুলে বলতে তিনি আমাকে কল দিতে দেন। এমন ঘটনার সাক্ষী আমার দেখা শহর কলকাতা।

অনেক ভালোলাগা-খারাপলাগা মিলেই প্রিয় শহর কলকাতা। তাই এই শহরে সময় কাটানোর বিকল্প কিছু ভাবতেই পারি না।

ফোটো: সোমদীপ রায়

ইতিহাসবিদ হয়েও সুসাহিত্যিক ড. নীহাররঞ্জন রায়

বুদ্ধদেব হালদার

সাহিত্য যখন ইতিহাসের বিষয় হয়ে ওঠে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যকে উপস্থাপন করার দিকেই ঐতিহাসিকের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু এই প্রথাকে যিনি সবার প্রথম অস্বীকার করে ইতিহাসকে সাহিত্যের সমান আসনে নিয়ে আসার কসরত করেছিলেন, তিনি দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি ইতিহাসবিদ ড. নীহাররঞ্জন রায়। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পকলা গবেষক ও পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক। যদিও তাঁকে আমরা একজন বরেণ্য ইতিহাসবিদ হিসাবেই চিনি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর আবেগ ও শ্রদ্ধা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এক অন্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। তিনি ইতিহাসকে কখনও নেগলেক্ট করেননি, বরং সাহিত্যের রস আস্বাদন থেকে ইতিহাসে পাঠককে তিনি বঞ্চিত করতে ভুলে গিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর সমসাময়িক কালের একটি রংরুট ওয়ার্ক। আর এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে ঐতিহাসিকের ভাবমূর্তি থেকে সাহিত্যিকের আসনে উত্তীর্ণ হতে অনেকাংশেই সহায়তা করেছে।

ড. নীহাররঞ্জন রায় ১৯০৩ সালের ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কায়েত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ময়মনসিংহতেই তিনি তাঁর স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় ও আনন্দমোহন কলেজে তিনি তাঁর পাঠ সমাপ্ত করার পর ১৯২৪ সালে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বিএ পাস করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের শিল্পকলা শাখায় এমএ পাস করেন। তিনি রেকর্ড মার্কসসহ এমএ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন ও ওই বছরই মৃণালিনী গোল্ড মেডেল সম্মান পান। ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ১৯৩০ সালে মোয়াট স্বর্ণপদক পান। ১৯৩৫ সালে তিনি ইউরোপ চলে যান। হল্যান্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া লন্ডন থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে ডিপ্লোমা নেন। ইতিমধ্যেই তিনি মণিকা রায়কে বিবাহ করেন ও তাঁর দুই পুত্র সন্তান ও এক কন্যা সন্তান লাভ হয়।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি প্রগতিশীল রাজনীতিচর্চার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই কখনও অনুশীলন সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হতে বা কখনও অসহযোগ আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেও দেখা গেছে। একসময় তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি 'লিবার্টি' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ পরিচালনা করতেন। আবার রিভ্যলুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির দলের সঙ্গেও কাজ করতে দেখা গেছে। আরএসপি দলের মুখপত্র 'ক্রান্তি' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হন, যদিও তার আগেই তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালে জেলে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৯৪৬ সালে শিল্পকলা বিষয়ে 'রানি বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় তাঁকে। তিনি সিমলায় প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ-এর প্রথম ডিরেক্টর বডি হিসাবে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ওই পদ অলংকৃত করেন। আবার ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ইউনেস্কো-র প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্মদেশ সরকারের সংস্কৃতি ও ইতিহাস-বিষয়ক উপদেশক ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেট ব্রিটেন, লন্ডন; রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন, লন্ডন; রয়াল সোসাইটি অব আর্টস, লন্ডন; ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব আর্টস, জুরিখ; এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতার ফেলো নির্বাচিত হন।

ইতিহাস, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছড়িয়ে রয়েছে ইংরেজি ও বাংলায় লেখা তাঁর অসংখ্য গ্রন্থে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র সাহিত্যের একজন অনুরাগী ও বিশিষ্ট আলোচক। তাঁর লেখা 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১) বইটি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অবদান বলে সমালোচকেরা মনে করেন। এছাড়া 'বাঙ্গালীর ইতিহাস- আদি পর্ব' (১৯৪১) তাঁর অন্যতম সেরা বই। এই বইটির জন্য তিনি ১৯৫০ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ'(১৩৫৪), 'An Artist in Life' (1967) , 'An Approach to Indian Art' (1974) ইত্যাদি বইগুলি বহু আলোচিত ও পঠিত। ১৯৬৯ সালে তিনি 'An Artist in Life' বইটির জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। তাঁর ভাষার আবেগ, বিষয়োপযোগী আধুনিক শব্দচয়ন, বাকভঙ্গি ব্যবহারের কৌশল ও তথ্যকে সাহিত্য রসে জারিত করে এনগ্রোস করে তোলার ক্ষমতা খুব কম ঐতিহাসিকের কলমেই আমরা পেয়েছি। ইতিহাসের বই হলেও সাহিত্যের রসবোধের অভাব সেখানে খুব একটা পাওয়া যায় না। একারণেই তিনি ঐতিহাসিক হয়েও সুসাহিত্যিক। বিশেষ সাংস্কৃতিক অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৬৯ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং ১৯৮০ সালে তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর মতো একজন ঐতিহাসিকের অবদান বিশ্বসংস্কৃতিতে বাংলা ও বাঙালি জাতির সার্বিক পরিচিতিকে মেলে ধরেছিল।